সূচিপত্র

ক্র. নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
i	সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস	১
ii	বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসের গ্রেডভিত্তিক তুলনা	৪
	বিসিএস জেনারেল ক্যাডার	
০১	বিসিএস প্রশাসন	৬
০২	বিসিএস খাদ্য	৪৩
০৩	বিসিএস নিরীক্ষা ও হিসাব	৪৮
০৪	বিসিএস শুল্ক ও আবগারি	৫২
০৫	বিসিএস কর	৫৬
০৬	বিসিএস পররাষ্ট্র	৬২
০৭	বিসিএস ডাক	১০২
০৮	বিসিএস পুলিশ	১০৭
০৯	বিসিএস আনসার	১৬১
১০	বিসিএস সমবায়	১৬৫
১১	বিসিএস বাণিজ্য	১৬৯
১২	বিসিএস তথ্য	১৭৮
১৩	বিসিএস পরিবার পরিকল্পনা	১৮৩
১৪	বিসিএস রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক	১৮৬
	বিসিএস টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ক্যাডার	
১৫	বিসিএস কৃষি	১৯০
১৬	বিসিএস মৎস্য	২০৪
১৭	বিসিএস পশুসম্পদ	২০৮
১৮	বিসিএস গণপূর্ত	২১২
১৯	বিসিএস জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	২২০
২০	বিসিএস সড়ক ও জনপথ	২২২
২১	বিসিএস রেলওয়ে প্রকৌশল	২২৪
২২	বিসিএস স্বাস্থ্য	২২৬
২৩	বিসিএস পরিসংখ্যান	২৬২
২৪	বিসিএস বন	২৬৫
২৫	বিসিএস সাধারণ শিক্ষা	২৭০
২৬	বিসিএস কারিগরি শিক্ষা	২৭১

সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস

সিভিল সার্ভিসের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনার মূল প্রতিষ্ঠান ছিল সিভিল সার্ভিস। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস ছিল দায়িত্বশীল রাজনৈতিক সরকারের ফসল। কিন্তু ভারতীয় সিভিল সার্ভিস তা ছিল না। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছিল প্রথমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (১৭৬৫-১৮৫৮) এবং পরে ব্রিটিশ রাজ্যের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ও পরিবেশ-পরিস্থিতি থেকে। ১৭৮৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূখণ্ডগত মালিকানা প্রধানত 'সুপারভাইজার' নামে অভিহিত কোম্পানির স্থানীয় বাণিজ্যিক অফিসারদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় সংস্থাগুলোর দ্বারা পরিচালিত হতো। কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্টদের বলা হতো কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভেন্ট। কোম্পানির শাসনের অবসান পর্যন্ত এবং তারপরও দীর্ঘদিন এ পদবিটি চালু ছিল। এ সার্ভিসের সদস্যরা ভারতে চাকরির জন্য ভারত সচিবের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন বিধায় এ চাকরির নাম হয়েছিল কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিস (সিসিএস)।

১৭৭২ সালে ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসনের অবসান হয়। এরপর বঙ্গদেশকে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট বলে কোম্পানির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। বাংলাদেশের ফোর্ট উইলিয়ম ও কাউন্সিলের গভর্নর জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত ওয়ারেন হেস্টিংস রেগুলেটিং অ্যাক্ট বলে প্রতিষ্ঠিত নতুন আমলাতন্ত্রের প্রধান হয়ে দাঁড়ান। কাউন্সিল নামে অভিহিত চার সদস্যের একটি কমিটি তাকে পরামর্শ ও সহায়তা দিতেন। রেগুলেটিং অ্যাক্ট বলে বঙ্গদেশের জন্য গঠিত ক্ষুদ্র আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর শীর্ষে ছিল এ কাউন্সিল। ক্ষমতার স্তর বিন্যাসে এ কাউন্সিলের পরেই ছিল রাজস্ব আদায়কারী দেশীয় জেলা কালেক্টর, যাদের বলা হতো দেওয়ান। তখনও নওয়াবি প্রতিষ্ঠানই বিচারবিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগ করত। দেওয়ানদের কাজকর্ম তদারককারী ইউরোপীয় জেলা সুপারভাইজারদের নামমাত্র বেতন দেওয়া হতো। সেটা পুষিয়ে দেয়ার জন্য তাদের ঘরোয়াভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রথমদিকের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিস ছিল একদিকে রাজস্ব আদায় এবং অন্যদিকে যুগপৎ ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা। নবগঠিত সিভিল সার্ভিস ছিল এমন এক ব্যবস্থা যার শীর্ষভাগে ছিলেন ইউরোপীয়রা এবং নিম্নস্তরে ছিলেন দেশীয়রা। সকল দেওয়ান বা স্থানীয় পর্যায়ের রাজস্ব প্রশাসকরা ছিলেন দেশীয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রশাসনিক ধারণাটির উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানি-রাষ্ট্রের সিভিল সার্ভিসে দেশীয় লোকদের সম্পৃক্ত করা। তিনি ফৌজদারি প্রশাসনের জন্য সদর নিজামত আদালত গঠন করেন এবং সে আদালত পরিচালনার সুযোগ দেন মূলত দেশীয় বিচারকদের। সদর দেওয়ানি আদালতও প্রধানত দেশীয় বিচারকদের বিশেষ করে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত হতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে বঙ্গদেশে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের জন্য সিভিল সার্ভিস উদ্ভাবন করতে গিয়ে হেস্টিংস একে ইউরোপীয় ও দেশীয়দের সমন্বিত একটি ব্যবস্থায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

১৭৯০ সাল নাগাদ এটি দৃশ্যমান হয়ে উঠে যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এখন আর পূর্বাঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের বাণিজ্যিক সংগঠন মাত্রই নয়, বরং সাম্প্রতিককালে উত্তর আমেরিকা ব্রিটেনের হাতছাড়া হওয়ার পর বাস্তবে এটা ব্রিটেনের নব অর্জিত বিকল্প সাম্রাজ্যেও পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পার্লামেন্ট হস্তক্ষেপ করে বসে এবং ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নব অর্জিত ভূখণ্ডের উপর আপন অধিকার জাহির করে। ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাস হয় যা সাধারণভাবে পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে অভিহিত। আইনে নতুন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্দেশ করে কাউন্সিলের গভর্নর-জেনারেল হিসেবে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত অথচ জনপ্রিয় জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসকে নিয়োগ করা হয়। আইনে ভারতের বিষয়াবলির জন্য একটি বোর্ড অব কমিশনার গঠন করা হয় যা সচরাচর বোর্ড অব কন্ট্রোল হিসেবে পরিচিত। এতে থাকতেন রাজা কর্তৃক নিযুক্ত কন্ট্রোলার অব এক্সচেকার, একজন সেক্রেটারি অব স্টেট এবং চারজন প্রিভি কাউন্সিলর।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৩ সালে তার একচেটিয়া অধিকার আংশিকভাবে এবং ১৮৩৩ সালে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। ১৮৩৩ সালের আইনবলে কোম্পানি রাজা বা রানির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় একটি সংস্থায় পর্যবসিত হয়। এ আইনে নয়া উদারপন্থি পার্লামেন্ট কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসে (সিসিএস) চাকরি ও সার্ভিস প্রদানের আদলে দেশীয়দের ক্ষমতার ভাগ দেয়ার অঙ্গীকার করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ১৮৫৩ সালের শেষ চার্টার অ্যাক্টের আগ পর্যন্ত কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসের দ্বার ভারতীয়দের জন্য বন্ধ ছিল। ১৮৫৩ সালের ওই চার্টার অ্যাক্ট বলে সিভিল সার্ভিসে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়। তখন থেকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সিসিএস-এ লোক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। ১৮৬১ সালের আইনবলে কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসের নতুন নামকরণ হয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস)। তবে আইসিএস-এ ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ব্যাপারটা মোটামুটি অসম্ভবই থেকে যায়। কারণ ভারতীয়দের লন্ডনে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হতো, আর সেটাও করতে হতো অত্যন্ত কম বয়সে এবং তাদের ইংল্যান্ডে দু'বছর শিক্ষানবিশ হিসেবে থাকতে হতো। আইসিএস পরীক্ষা দেয়ার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়া বিপুল খরচের ব্যাপারই শুধু ছিল না, সমুদ্র পাড়ি দেয়ার বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিধিনিষেধেরও সম্মুখীন হতে হতো। মুসলমানরা তখনও ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি বলে তারা আইসিএস পরীক্ষা দিতে পারত না। ১৮৬৩ সালের আগ পর্যন্ত কোনো ভারতীয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য হতে পারেনি। সে বছর সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ভারতীয় হিসেবে আইসিএস সদস্য হন। একজন দু'জন করে ভারতীয়দের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হবার এ ধারাটি বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এরপর আইসিএস পরীক্ষা যুগপৎ ইংল্যান্ড ও ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া শুরু হয় এবং আগের তুলনায় আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয়কে সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার নীতি গ্রহণ করা হয়।

সিভিল সার্ভিসে অধিক সংখ্যক ভারতীয়দের যোগদানের সুবিধার্থে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড লিটন (১৮৭৬-১৮৮০) ১৮৭৯ সালে একটি বিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যবস্থায় যেসব পদ আগে কভেন্যান্টেড সিভিল সার্ভিসের অধীনে ছিল তার এক-ষষ্ঠাংশ পদ প্রাদেশিক সরকারগুলোর মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণের বিধান রাখা হয়। এ নতুন চাকরিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবশ্য কুলীন বংশীয় লোক হতে হতো। এটি ছিল একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যার উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় এলিট শ্রেণির লোকদের ক্ষমতার ভাগ দেওয়া। কিন্তু এ ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায়নি। কারণ কুলীন বংশীয় প্রার্থীরা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ছিল এমনটা কদাচিতই লক্ষ্য করা যেত। পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত হয় যে, কুলীন বংশীয় লোকদের সুবিধামতো অধস্তন চাকরিতে বিশেষ করে সিভিল সার্ভিসের বিচার বিভাগীয় শাখায় নিয়োগ দেওয়া যাবে।

ভারতে আইসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং সিভিল সার্ভিসে আরোও বেশি সংখ্যায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের ক্রমবর্ধমান দাবির প্রেক্ষাপটে একটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা সরকারি কর্মকমিশন গঠন করা হয়। স্যার সি. আইচিসনকে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। সিনিয়র আইসিএস সদস্য ও পাঞ্জাবের প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর আইচিসন একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন যা ১৮৮৯ সালে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত এবং ১৮৯১ সালে বাস্তবায়িত হয়। নতুন পরিকল্পনায় সংবিধিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস বিলুপ্ত করা হয়। সরকারের বেসামরিক অফিসারদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়- ইম্পিরিয়াল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, প্রভিন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস ও সাবোর্ডিনেট সিভিল সার্ভিস। প্রথমটির ক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা আগের মতো ইংল্যান্ডেই রাখা হয়। তবে বলা হয় যে, যেসব ভারতীয় ইংল্যান্ডে গিয়ে লন্ডনে পরীক্ষা দিতে পারবে তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া যাবে। অপর দুই সার্ভিসের ক্ষেত্রে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা ভারতেই করা হয় এবং অধিকাংশ প্রার্থীকে ভারতীয়দের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিসের জন্য লোক নিয়োগ তিনটি পদ্ধতিতে করা হতো- পরীক্ষার মাধ্যমে, মনোনয়নের মাধ্যমে এবং অধস্তন চাকরি থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে। ১৮৯৩ সালে কমন্সসভা সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষাগুলো যুগপৎ ইংল্যান্ড ও ভারতে অনুষ্ঠানের একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগ পর্যন্ত প্রস্তাবটি কেবল সাধু অভিলাষ হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। এ পরিকল্পনায় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের নিচে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস গঠন করা হয়, আর প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের অধীনে গঠন করা হয় সাবোর্ডিনেট বা অধস্তন সিভিল সার্ভিস।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ইতিহাস

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সংক্ষিপ্ত রূপ বিসিএস নামে সর্বাধিক পরিচিতি) হলো বাংলাদেশ সরকারের সিভিল সার্ভিস। এটি প্রাক্তন সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস অব পাকিস্তান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা ঔপনিবেশিক শাসনামলের ব্রিটিশ সম্রাজ্ঞী নিয়ন্ত্রিত ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের উত্তরসূরি ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে এটি সিভিল সার্ভিস অধ্যাদেশের দ্বারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস হিসাবে পরিচিতি হয়। এর মূলনীতি ও পরিচালনা পরিষদ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হয়।

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রধানত বিভিন্ন সরকারি চাকুরি ও পদে নিয়োগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক সংস্থা। সংস্থাটি সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি, শৃঙ্খলা ও আপিলের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গেও জড়িত। ব্রিটিশ শাসনের ঐতিহ্যবাহী অধিকাংশ দেশে 'সিভিল' বা 'পাবলিক' সার্ভিস কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ প্রদান এবং চাকুরি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সকল সিদ্ধান্ত যাতে মেধা ও সমদর্শিতার নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে এই সংস্থা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন নামে অভিহিত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৩৪ নং আদেশবলে ১৯৭২ সালের মে মাসে প্রাথমিক পর্যায়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশন (প্রথম) ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন (দ্বিতীয়) নামে দুটি আলাদা কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে গৃহীত সংবিধানে পাবলিক সার্ভিস কমিশন সংক্রান্ত ধারাসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার নতুন একটি রাষ্ট্রপতি-আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৫, ১৯৭৩) জারি করে যা কার্যত ১৯৭২ সালের মে মাস থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন দুটির আনুষ্ঠানিক নিয়মিতকরণ সম্পন্ন করে। অবশ্য সরকার ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে দুটি কমিশনের স্থলে একটি কমিশন স্থাপন করার লক্ষ্যে আরেকটি অধ্যাদেশ জারি করে এবং ১৯৭৭ সালের ২২ ডিসেম্বর এই কমিশনের নামকরণ হয় বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

আইনগত ভিত্তির পরিবর্তে বরং সাংবিধানিক ভিত্তিই বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সংবিধানের পাঁচটি অনুচ্ছেদ সংবলিত একটি অধ্যায়ে (৯ম ভাগের ২য়) কমিশনের গঠনপ্রণালি ও কার্যাবলি নির্দেশিত হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক (কার্যত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে) পাঁচ বছর মেয়াদে অথবা তাদের বয়স পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিয়োগযোগ্য সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন সদস্যের সংখ্যা সংবিধানে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তবে ১৯৭৭ সালে জারিকৃত রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশে চেয়ারম্যানসহ এ সংখ্যা সর্বোচ্চ পনেরো (ন্যূনতম ছয়) নির্ধারণ করা হয়েছে। সদস্য হিসেবে নিয়োগ লাভের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। তবে কমিশনের মোট সদস্যের অন্তত অর্ধেক থাকবেন ন্যূনতম বিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারি কর্মকর্তা। সাধারণত সরকারি বিভাগ থেকে নিযুক্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সকলেই শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন এবং অন্যান্যদের অধিকাংশই থাকেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ। সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর একজন কর্মকর্তা পুনরায় কোনো সরকারি চাকুরিতে (পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ) নিয়োগ লাভের যোগ্য বিবেচিত হননি। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, যিনি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ সত্ত্বেও চেয়ারম্যান হিসেবে অতিরিক্ত এক মেয়াদের জন্য এবং একইভাবে কমিশনের একজন সদস্যও অবসর গ্রহণের পর কমিশনের সদস্য বা চেয়ারম্যান হিসেবে অতিরিক্ত এক মেয়াদের জন্য পুনরায় নিয়োগ পেতে পারেন।

সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.জেড. এম. শামসুল আলম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মহাপরিচালক পদটি ৩১ মার্চ, ২০১৩ তারিখে রেক্টর হিসেবে পরিবর্তিত হয়েছে।

বিসিএস পরীক্ষা

বিসিএস (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

ক্যাডার বলতে বোঝায় বিভিন্ন সরকারি বিভাগের জন্য নির্ধারিত কর্মকর্তাদের একটি দল, যারা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত। ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ সিভিল (ইকোনমিক) ক্যাডারকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাথে একীভূত করার পর থেকে সর্বমোট ২৬টি ক্যাডারে বিসিএস-এ নিয়োগ হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বিসিএস-এর নিম্নোক্ত ২৬টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তরবিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বিসিএস-এর ২৬টি ক্যাডারের নাম

ক্রম.	ক্যাডারের পদসমূহ	সাধারণ/ কারিগরি/ পেশাগত ক্যাডার
১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)	সাধারণ ক্যাডার
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সাধারণ ক্যাডার
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি)	সাধারণ ক্যাডার
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর)	সাধারণ ক্যাডার
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	সাধারণ ক্যাডার
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক)	সাধারণ ক্যাডার
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)	সাধারণ ক্যাডার
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার)	সাধারণ ক্যাডার
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়)	সাধারণ ক্যাডার
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা)	সাধারণ ক্যাডার
১১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশুসম্পদ)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার

বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসের গ্রেডভিত্তিক তুলনা

গ্রেড	বেতন স্কেল	প্রশাসন ক্যাডার		পুলিশ ক্যাডার			পররাষ্ট্র ক্যাডার		কাস্টমস ক্যাডার	কর ক্যাডার	শিক্ষা ক্যাডার	নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডার	খাদ্য ক্যাডার	আনসার ক্যাডার	
		মন্ত্রণালয়	মাঠ প্রশাসন	সদর দপ্তর	মেট্রো	মাঠ	মন্ত্রণালয়	মিশন Consulate General/ High Commission						সদর দপ্তর	মাঠ পর্যায়
৯ম	২২০০০-৫৩০৬০/-	সহকারী সচিব	সহকারী কমিশনার	এএসপি	সহকারী পুলিশ কমিশনার	এএসপি	সহকারী সচিব	Third Secretary	সহকারী কমিশনার ও শুল্ক আবগারি	সহকারী কর কমিশনার	প্রভাষক	AAG/UAO/ AGGA/AO/ A&AO/ ACAFO/ADCA/ AP/AME	সহকারী পরিচালক	সহকারী পরিচালক	সহকারী জেলা কমান্ডার
৭ম	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	উপপরিচালক	-	সহকারী জেলা কমান্ডার
৬ষ্ঠ	৩৫৫০০-৬৭০১০/-	সিনিয়র সহকারী সচিব	সিনিয়র সহকারী কমিশনার/ ইউএনও/এডিসি	এডিশনাল এসপি	এডিসি	এডিশনাল এসপি	সিনিয়র সহকারী সচিব	Second Secretary	উপ কমিশনার শুল্ক ও আবগারি	উপ কর কমিশনার	সহকারী অধ্যাপক	DAFO/DCGA/ ME/DDCA/ DCAFO	অতিরিক্ত পরিচালক	উপপরিচালক	জেলা কমান্ড্যান্ট/ অধিনায়ক ব্যাটালিয়ন
৫ম	৪৩০০০-৬৯৮৫০/-	উপ-সচিব	জেলা প্রশাসক (ডিসি)/ উপ-পরিচালক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	এআইজি	ডিসি	এসপি	পরিচালক	Counselor/ counsul	যুগ্ম কমিশনার শুল্ক ও আবগারি	যুগ্ম কর কমিশনার	সহযোগী অধ্যাপক	CAFO/Addl. Accountant General (AAG)/ SA/Addl. CGA	পরিচালক	পরিচালক	-
৪র্থ	৫০০০০-৭১২০০/-	-	-	অতিরিক্ত ডিআইজি	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার	অতিরিক্ত ডিআইজি	-	-	অতিরিক্ত কমিশনার শুল্ক ও আবগারি	অতিরিক্ত কর কমিশনার	-	CAFO/Divisional Controller of Accountant (DCA)/SSA	-	-	-
৩য়	৫৬৫০০-৭৪৪০০/-	যুগ্ম সচিব	বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার	ডিআইজি	-	ডিআইজি	মহাপরিচালক	Consul General/ Minister Ambassador (Category C)/ Consul/ Assistant H.C.	কমিশনার	কর কমিশনার	অধ্যাপক	-	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	উপ মহাপরিচালক	রেঞ্জ কমান্ডার
২য়	৬৬০০০-৭৬৪৯০/-	অতিরিক্ত সচিব	-	অতিরিক্ত আইজিপি	-	-	অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব	Consul General/ Deputy HC/ Ambassador (Category B)	সদস্য (NBR)	সদস্য (NBR)	অধ্যাপক	Addl. CGA (Admin)	মহাপরিচালক	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	-
১ম	৭৮০০০/-	সচিব	-	অতিরিক্ত আইজিপি	পুলিশ কমিশনার (ঢাকা)	-	সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	Ambassador/ HC	সদস্য (NBR)	সদস্য (NBR)	অধ্যাপক	CGA	সচিব	মহাপরিচালক	-
Special Grade	৮২,০০০	সিনিয়র সচিব	-	আইজিপি	-	-	পররাষ্ট্র সচিব	-	চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান	-	-	-	-	-
মন্ত্রিপরিষদ সচিব / মুখ্য সচিব															

* কাস্টম্‌স ও কর ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদসোপান হলো সদস্য NBR । কাস্টম্‌স ও কর ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ চেয়ারম্যান, পদটি পুল সার্ভিস থেকে সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

* বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদসোপান হলো মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর। খাদ্য ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ সচিব, পদটি পুল সার্ভিস থেকে সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

* CGA (Controller Gerneral of Accounts) হলো নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ। অপরদিকে CAG (Comptroller and Auditor General) হলো সাংবিধানিক পদ। যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

* আনসার ক্যাডার এর সদর দপ্তরের সর্বোচ্চ পদ উপ মহাপরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের রেঞ্জ কমান্ডার। অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং মহাপরিচালক পদ দুটি সেনাবাহিনী কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

* পুলিশ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত আইজিপি, মহাপরিচালক র‍্যাব ও পুলিশ কমিশনার ঢাকা গ্রেড-০১ স্কেল। অন্যান্য পুলিশ কমিশনার গ্রেড-০৩। আইজিপি ও পররাষ্ট্র সচিব সরাসরি সিনিয়র সচিব পদ মর্যাদার এবং স্পেশাল গ্রেড প্রাপ্ত হন।

বিসিএস প্রশাসন

পরিচিতি

বর্তমানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ২৬টি ক্যাডারের মধ্যে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল। এ ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে কর্মচারীরা সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা, বিভিন্ন ক্যাডারের কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আইন রক্ষা, নির্দেশ দান ও ক্ষেত্রবিশেষে মোবাইল কোর্ট গঠনের ক্ষমতা রাখেন তাঁরা। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও পূর্ণ সচিব পর্যায়ের পদে অধিকাংশ সময় প্রশাসন ক্যাডার থেকেই নিয়োগ দেওয়া হয়। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে শুরুতে সহকারী কমিশনার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

ইতিহাস

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের পর তৎকালীন সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) এবং ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (ইপিসিএস)-এর সমন্বয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডার গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালে মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মচারী বাছাইয়ের জন্য Superior Post Examination Rules-এর আওতায় লিখিত পরীক্ষা (১৩০০ নম্বর), সাইকোলজিক্যাল টেস্ট (১০০ নম্বর) ও মৌখিক পরীক্ষা (২০০ নম্বর) চালু করা হয়।

১৯৭৯ সালে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদানকৃত কর্মচারীদের পদের নাম করা হয়- 'সহকারী কমিশনার'। ১৯৮০ সালে ৩০টি ক্যাডার অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অধ্যাদেশ জারি করা হয়। অধ্যাদেশটি জারি হয় চাকুরি (পুনর্গঠন ও শর্তাবলি) আইন ১৯৭৫ অনুযায়ী। ১৯৮২ সালে জারিকৃত BCS Examination Rules 1982 অনুযায়ী মোট ১৩০০ নম্বরের লিখিত, ১০০ নম্বরের সাইকোলজিক্যাল টেস্ট ও ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা (মোট ১৬০০) গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এ নিয়মে ১৯৮২ সালে প্রথম বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। Bangladesh Civil Service (Recruitment) Rules, 2014 অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষা তিন ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ধাপে ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি (MCQ) পরীক্ষা নেওয়া হয়, যা বাছাইমূলক এবং এর নম্বর চূড়ান্ত মেধাতালিকায় যোগ হয় না। প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণরা ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য শেষ ধাপে ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ফলে চূড়ান্ত মেধাতালিকা লিখিত (৯০০) ও মৌখিক (২০০) পরীক্ষার মোট ১১০০ নম্বরের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

কর্মক্ষেত্র

যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে ব্যুরোক্র্যাটদের হাত ধরে। এই ব্যুরোক্র্যাট কিংবা আমলারা প্রধানত প্রশাসন ক্যাডার থেকেই আসেন। অর্থাৎ দেশের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে থাকেন প্রশাসনের লোকজন। তাঁদের দেশের পলিসি মেকার বলা হয়। বিষয়টা আরো সহজ করে বললে, দেশের সব ধরনের নীতি নির্ধারক অর্থাৎ দেশের মন্ত্রিপরিষদ, ইউএনও কিংবা ডিসি সবাই-ই সরাসরি বিভাগীয় মন্ত্রিপরিষদের তত্ত্বাবধানেই থাকেন। শুধু তাই নয়, উপসচিব থেকে শুরু করে এর উপরে যত সরকারি কর্মচারী আছেন তাঁদের প্রায় ৭৫ শতাংশ প্রশাসন ক্যাডার থেকে নিযুক্ত হন; অন্যান্য ক্যাডার ও সিনিয়র অফিসার মিলে বাকি ২৫ শতাংশ পূর্ণ হয়। প্রশাসন কিংবা এডমিন ক্যাডার এর বিচরণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি, সাধারণ জনগণসহ সব ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে সবজায়গায় রয়েছে। মূলত প্রশাসন ক্যাডারে কেউ যখন নিযুক্ত হয় তখন মাঠ প্রশাসনে (বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসনিক বিভাগকে মাঠ প্রশাসন বলে) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগদান করতে হয়। এ পদে জব রেস্পন্সিবিলিটি বা দায়িত্বের মধ্যে প্রধান হলো অন্যান্য অফিসার ও ক্যাডারদের কাজের সমন্বয় করা। বিশেষভাবে আলোচিত মোবাইল কোর্টও তাঁদেরই পরিচালনা করতে হয়। সাধারণত গড়ে ৬ বছর লেগে যায় ইউএনও (সিনিয়র সহকারী কমিশনার) হতে এবং ১০ বছর লেগে যায় উপসচিব পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে।

বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের যোগদান ও স্থায়ীকরণ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীকে প্রথমেই তাঁর নিজ বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে যোগদান করতে হয়। যোগদানের পর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে সপ্তাহ/পক্ষকালব্যাপী সংযুক্তিকরণ কোর্স এ অংশগ্রহণ করতে হয়। উক্ত কোর্স শেষে জেলা প্রশাসক কার্যালয়-এ 'শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনার' ও 'এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট' হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় যেসব কোর্সে অংশ নিতে হয় সেসব হলো- বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, কেইস এনোটেশন, ট্রেজারি ট্রেনিং, সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ট্রেনিং এবং আইন ও প্রশাসন। ছয়মাস জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসে সংযুক্ত থাকতে হয়। নির্বাচন চলাকালীন ও পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হয়। শিক্ষানবিশকালে ৩০০ নম্বরের বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে, চাকুরির দু'বছর অতিক্রম হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় স্থায়ীকরণ আদেশ জারি করে।

বিসিএস প্রশাসন একাডেমি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি সর্বপ্রথম 'গেজেটেড অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি' (GOTA) হিসেবে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এ একাডেমিকে 'সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমি' (COTA) হিসেবে নামকরণ করা হয়। তৎকালীন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) আওতাধীন সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৮৭ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে এ একাডেমিকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি হিসেবে নামকরণ করা হয়। এর অবস্থান ঢাকার শাহবাগে।

একাডেমি কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশাসন ক্যাডারের নিয়োগকৃত নবীন কর্মচারীদের জন্য ছয় মাস মেয়াদি আইন ও প্রশাসন সংক্রান্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, এক বছর মেয়াদি "মাস্টার ইন পাবলিক পলিসি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (MPPM)" কোর্স পরিচালনা করা হয়। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস কর্মচারীদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মাঝে মাঝে এ একাডেমিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

কেন্দ্রীয় প্রশাসন বলতে সচিবালয়, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এই চারটি স্তর নিয়ে গঠিত প্রশাসনের কেন্দ্রীয় কাঠামোকে বোঝায়, যেখান থেকে প্রশাসনের সকল নীতি নির্ধারণমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ পরিচালনা করা হয়।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পদসোপান

সচিব (Secretary)
↑
অতিরিক্ত সচিব (Additional Secretary)
↑
যুগ্মসচিব (Joint Secretary)
↑
উপসচিব (Deputy Secretary)
↑
সিনিয়র সহকারী সচিব (Senior Assistant Secretary)
↑
সহকারী সচিব (Assistant Secretary)

সচিবালয়

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সমষ্টি হচ্ছে সচিবালয়। অন্যকথায়, সকল মন্ত্রণালয়ের অফিসকে একত্রে সচিবালয় বলে। সচিবালয় হচ্ছে প্রশাসনিক কাঠামোর স্নায়ুকেন্দ্র। সচিবালয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, আইন পরিষদে মন্ত্রীদের দায়িত্ব পালনে সহায়তা দান করে।

বাংলাদেশে সচিবালয় মোট ৫টি। যথা-

(ক) রাষ্ট্রপতির সচিবালয়; (খ) জাতীয় সংসদ সচিবালয়; (গ) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়; (ঘ) কর্ম কমিশন সচিবালয় ও (ঙ) বাংলাদেশ সচিবালয়।

সচিব

সচিব হলেন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি এর প্রশাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ন্যস্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। সচিব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও অধীন অফিসসমূহে কার্যবিধি অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি করেন এবং এ সকল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অবহিত করেন। এছাড়া সচিব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ বাজেট ও প্রচলিত হিসাববিধি অনুযায়ী হওয়ার বিষয়টিও তদারকি করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সম্পাদনের তাগিদে প্রয়োজনীয় উপাত্ত, তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করেন সংশ্লিষ্ট সচিব। সর্বোপরি, একজন সচিব অধীন কর্মচারীদের মধ্যে অর্পিত ক্ষমতা বণ্টন এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যসম্পাদনের ধরন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও স্থায়ী আদেশ প্রদান করে থাকেন। সচিবদের ৭৫ ভাগ নিয়োগ হয় প্রশাসন ক্যাডার থেকে এবং বাকি ২৫ ভাগ নিয়োগ হয় সিভিল সার্ভিসের অন্যান্য ক্যাডার থেকে। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব একজন বিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডার থেকেই হয়ে থাকেন।

পরিদপ্তর

মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের অধীন এক বা একাধিক ইউনিট কে পরিদপ্তর বলা হয়। পরিদপ্তরগুলি সাধারণত বিশেষায়িত প্রযুক্তিগত বা তত্ত্বাবধায়কের কাজ করে। পরিদপ্তরের প্রধান একজন পরিচালক যিনি একজন যুগ্মসচিব বা উপসচিবের পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি। বিস্ফোরক পরিদপ্তর, বস্ত্র পরিদপ্তর, শ্রম পরিদপ্তর, সেবা পরিদপ্তর ইত্যাদি।

মাঠ প্রশাসন: প্রশাসনিক সুবিধার্থে সরকার দেশের সমগ্র অঞ্চলকে জেলা, থানা, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভক্ত করে সেখানে যে প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বা পরিচালনা করে তাকে মাঠ প্রশাসন বলা হয়।

বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner)
↑
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (Additional Divisional Commissioner)
↑
জেলা প্রশাসক (Deputy Commissioner)
↑
সিনিয়র সহকারী কমিশনার (Senior Assistant Commissioner)
↑
সহকারী কমিশনার (Assistant Commissioner)

কেন্দ্রীয় প্রশাসন বা সচিবালয়ের প্রশাসনের সাথে মাঠ প্রশাসনের তুলনা:-

কেন্দ্রীয় প্রশাসন	মাঠ প্রশাসন
সিনিয়র সচিব	সমতুল্য পদ নেই।
সচিব	সমতুল্য পদ নেই।
অতিরিক্ত সচিব	বিভাগীয় কমিশনার।
যুগ্মসচিব	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।
উপসচিব	জেলা প্রশাসক।
সিনিয়র সহকারী সচিব	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
সহকারী সচিব	সহকারী কমিশনার।

বিভাগীয় প্রশাসন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের পরই বিভাগীয় প্রশাসনের স্থান। বাংলাদেশে বর্তমানে আটটি বিভাগ রয়েছে এবং প্রতিটি বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার আছেন। বিভাগীয় কমিশনারকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ থাকেন।

বিভাগীয় কমিশনারের কাজ:

- **প্রশাসনিক কাজ:** বিভাগীয় কমিশনার জেলা প্রশাসকগণের কাজের সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিভাগীয় কমিশনার তাঁর বিভাগের সহকারী কমিশনারদের বদলি করেন। তিনি জেলা প্রশাসনের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের এবং রাজস্ব বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ করেন।
- **ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ:** বিভাগীয় কমিশনার নিজ বিভাগের রাজস্ব সংগ্রহ ও তত্ত্বাবধান এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনাকারী। তিনি নিজ বিভাগের জেলাসমূহের রাজস্ব কর্মচারীদের কার্যাবলি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন।
- **উন্নয়নমূলক কাজ:** বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি। তিনি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের সমন্বয় সাধন করেন। বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত।
- **সেবামূলক কাজ:** দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ভূমিকম্প, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বিভাগীয় কমিশনার জনগণের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- **শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কাজ:** বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকার বলে বিভাগীয় সদরের সরকারি কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- **ক্রীড়া ও সংস্কৃতিবিষয়ক কাজ:** তিনি বিভাগীয় ক্রীড়া বোর্ডের সভাপতি। তাঁর পরিচালনায় জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।
- **সরকারকে অবহিতকরণ:** বিভাগের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সার্বিক পরিস্থিতি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিভাগীয় কমিশনার সরকারকে অবহিত করে থাকেন।

- কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোনো অভিযোগ বা কেস সম্পর্কে তদন্ত করতে পারেন।
- CrPC এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
- অবৈধ সমাবেশ বা দাঙ্গা দমনে পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশনা প্রদান করেন।
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন।
- VIP ব্যক্তিদের প্রটোকল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট

১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজেস আইন এর ৩(৩১) ধারা মোতাবেক যিনি ফৌজদারি কার্য বিধির ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তাকে ম্যাজিস্ট্রেট বলে। অন্য কথায়, যিনি ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করে বিচার করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছেন তিনিই ম্যাজিস্ট্রেট। General Clauses Act, ১৮৯৭-এর ৩ (৩১) ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: "Magistrate" shall include every person exercising all or any of the powers of Magistrate under the code of Criminal Procedure for the time being in force.

ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকারভেদ: The Code of Criminal Procedure, 1898-এর ৬(২) ধারা অনুযায়ী দুই শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে। যথা:
a) Judicial Magistrate b) Executive Magistrate
এই দুই শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে Executive Magistrate হিসেবে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার থেকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এটি কোনো স্থায়ী পদ নয়।

Executive Magistrate বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ:
ফৌজদারি কার্যবিধি বা The Code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) এর ১০ ধারানুযায়ী Executive Magistrate বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।
ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

- বে-আইনি সভা সমাবেশ ভঙ্গ করা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশকে ব্যবহার করা প্রয়োজনে ১৪৪ (CrPC'র ধারা-১২৭, ১২৮) ধারা জারি করা।
- পাবলিক পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠানের সময় দায়িত্ব পালন করা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা।
- নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রিটার্নিং অফিসারদের সহায়তা করা।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রিলিফের কাজ তত্ত্বাবধান করা এবং পরিচালনা করা।
- CrPC'র ১৬৪নং ধারা অনুসারে আসামি বা সাক্ষীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেওয়া ।
- অবৈধভাবে সরকারি বা বেসরকারি সম্পত্তি দখলদারদের উচ্ছেদের সময় উপস্থিত থাকা।
- নিলাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করা।
- মৃত ব্যক্তির সুরতহাল তদন্ত করা অথবা প্রয়োজনে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে পারেন।
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা। (মোবাইল কোর্ট আইন – ২০০৯ অনুযায়ী)
- জেলখানা পরিদর্শন এবং বিচারাধীন কয়েদিদের অবস্থা দেখা এবং তাদের সম্পর্কে খবর নেয়া।
- জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশক্রমে পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণের বিষয় তদন্ত করা।

মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯

মোবাইল কোর্ট আইন পাস হয় ২০০৯ সালের ৬ অক্টোবর। এই আইনের মোট ধারা ১৭টি এবং এই আইনের তফসিলভুক্ত আইনের সংখ্যা ১১৮টি।

মোবাইল কোর্ট: আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করার লক্ষ্যে আবশ্যক ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে নিয়ে দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে কিংবা যেকোনো জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত আদালতকে মোবাইল কোর্ট বলে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৪ ধারায় মোবাইল কোর্টের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা

- ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন কোন অপরাধ, যা কেবল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য, তার সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকলে তিনি উক্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, দোষী সাব্যস্ত করে, এই আইনের নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করতে পারবে।

- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সময় যদি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এইরূপ মনে হয় যে, অপরাধ স্বীকারকারী ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অপরাধ এমন গুরুতর যে, এই আইনের অধীন নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করা হলে উহা যথোপযুক্ত দণ্ডারোপ হবে না, তা হলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড আরোপ না করে তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করবেন।
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সময় যদি এইরূপ কোন অপরাধ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়, যা সেশন আদালত কিংবা অন্য কোন উচ্চতর বা বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য, তা হলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এজাহার হিসাবে গণ্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন।

মোবাইল কোর্টের পরিচালনা পদ্ধতি

- আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সময় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হবার পরপরই মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিতভাবে গঠন করে উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনাবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ স্বীকার করেন কি না তা জানতে চাইবেন এবং স্বীকার না করলে তিনি কেন স্বীকার করেন না তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চাইবেন।
- অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করিলে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে তাতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমত, টিপসই এবং দুইজন উপস্থিত স্বাক্ষীর স্বাক্ষর বা, ক্ষেত্রমত, টিপসই গ্রহণ করতে হবে; এবং অতঃপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত দণ্ড আরোপ করে লিখিত আদেশ প্রদান করবেন এবং উক্ত আদেশে স্বাক্ষর করবেন।
- অভিযোগ অস্বীকার করে আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করবেন।
- অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করবেন।

দণ্ড আরোপের বিধান

- এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দণ্ড আরোপ করার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে দণ্ডই নির্ধারিত থাকুক না কেন, দুই বছর এর অধিক কারাদণ্ড এই আইনের অধীন আরোপ করা যাবে না।
- সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে অর্থদণ্ড নির্ধারিত আছে উক্ত অর্থদণ্ড বা অর্থদণ্ডে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করা যাবে।
- ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন যে পদ্ধতিতে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড আদায়যোগ্য বা আরোপনীয় হয়ে থাকে, এই আইনের অধীন অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড অনুরূপ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য ও আরোপনীয় হবে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনার উদ্দেশ্য

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর লক্ষ্য এবং এই আইনের ৪ ধারা বিশ্লেষণ করলে মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ প্রতিভাত হয়:

১. ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধ আমলে নিয়ে ও দণ্ড আরোপ করে জননিরাপত্তা বিধান ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা;
২. ক্ষুদ্র প্রকৃতির বিষয়গুলোর মামলার কারণে আদালতগুলোর অযথা ভারযুক্তি রোধকল্পে কাজ করা;
৩. সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা;
৪. কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে অপরাধ প্রতিরোধ করা;
৫. জনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা;
৬. জনসমক্ষে দণ্ড আরোপের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি।

মোবাইল কোর্টের সাংবিধানিক বৈধতা

সংবিধানের ১০২ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জরুরি অবস্থা ও জনস্বার্থে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ বৈধ। এ কারণে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০২৩ সালে হাইকোর্টের রায় স্থগিত রেখে মোবাইল কোর্টকে বৈধ ঘোষণা করে।

Warrant of Precedence

পদ মানক্রম (Warrant of Precedence) হচ্ছে বিদেশি কূটনীতিক কোরের সদস্যবর্গসহ রাষ্ট্রের নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীদের পদের আপেক্ষিক মানক্রম। রাষ্ট্রীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ ও তাঁদের আসনের ব্যবস্থা, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীসহ অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বিদেশ গমন ও প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁদের বিদায় ও অভ্যর্থনা জানানো এবং সমপর্যায়ের বিদেশি অতিথিদের দেশে স্বাগতম ও পরে বিদায় জানানোর আনুষ্ঠানিকতার ক্ষেত্রে সাধারণত পদ মানক্রম অনুসরণ করা হয়।

সর্বশেষ জারিকৃত পদ মানক্রমে ২৫টি স্তরের ক্রমিক অবস্থান নিম্নরূপ

ক্রম	পদ
১	▪ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি
২	▪ প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী
৩	▪ জাতীয় সংসদের স্পিকার
৪	▪ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ▪ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিবৃন্দ
৫	▪ বাংলাদেশের মন্ত্রীবর্গ ▪ প্রধান হুইপ ▪ সংসদের ডেপুটি স্পিকার ▪ সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা
৬	▪ মন্ত্রিপরিষদের সদস্য না হয়েও মন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ▪ মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ▪ ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র
৭	▪ বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের হাইকমিশনারগণ
৮	▪ প্রজাতন্ত্রের প্রতিমন্ত্রীগণ ▪ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ▪ পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ▪ সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা ▪ হুইপ ▪ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ (আপিল বিভাগ)
৯	▪ নির্বাচন কমিশনারগণ ▪ প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ▪ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণ
১০	▪ প্রজাতন্ত্রের উপমন্ত্রীগণ
১১	▪ উপমন্ত্রীর মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ▪ বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদেশি দূতবর্গ
১২	▪ মন্ত্রিপরিষদ সচিব ▪ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ▪ সেনাবাহিনীর প্রধান ▪ নৌবাহিনীর প্রধান ▪ বিমানবাহিনীর প্রধান
১৩	▪ জাতীয় সংসদের সদস্যগণ
১৪	▪ বাংলাদেশে নিযুক্ত নন এমন সফররত বিদেশি রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ
১৫	▪ অ্যাটর্নি জেনারেল ▪ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ▪ ন্যায়পাল ▪ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ▪ সিনিয়র সচিবগণ

ক্রম	পদ
১৬	▪ সরকারের সচিবগণ ▪ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ▪ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপদমর্যাদার অফিসারগণ ▪ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ▪ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ▪ সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন
১৭	▪ সচিব পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত সরকারি কর্মচারীবৃন্দ ▪ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যগণ ▪ জাতীয় অধ্যাপকগণ ▪ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা বিভাগের মহাপরিচালক ▪ পূর্ণ সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
১৮	▪ পৌর কর্পোরেশনের মেয়রগণ (স্ব স্ব এলাকায়)
১৯	▪ সরকারের অতিরিক্ত সচিবগণ ▪ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ▪ বাংলাদেশে নিযুক্ত সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত বিদেশি রাষ্ট্রদূতগণ ▪ বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত ও হাই কমিশনারগণ ▪ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেকশন গ্রেডের প্রফেসরগণ ▪ রাষ্ট্রীয় কর্পোরেশনসমূহের চেয়ারম্যান ▪ ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক
২০	▪ অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মচারীগণ ▪ বাংলাদেশ বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ▪ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ▪ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যগণ ▪ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ ▪ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার
২১	▪ সরকারের যুগ্ম সচিবগণ ▪ বিভাগীয় কমিশনারগণ (স্ব স্ব দায়িত্বের আওতায়) ▪ চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) ▪ সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপদমর্যাদার অফিসারগণ ▪ সার্ভেয়ার জেনারেল অব বাংলাদেশ ▪ অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ
২২	▪ যুগ্মসচিব পদমর্যাদার সরকারি কর্মচারীগণ ▪ বিভাগীয় কমিশনারগণ (নিজ দায়িত্বের আওতার বাহিরে) ▪ পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (স্ব স্ব দায়িত্বের আওতায়) ▪ কারা মহাপরিদর্শক ▪ সেনাবাহিনীতে পূর্ণ কর্নেল পর্যায়ের অফিসার এবং সম পর্যায়ের নৌ ও বিমান বাহিনীর অফিসারবৃন্দ
২৩	▪ অতিরিক্ত কমিশনারগণ (নিজ নিজ দায়িত্বের আওতায়) ▪ পৌর কর্পোরেশনের মেয়রগণ (নিজ দায়িত্বের আওতার বাহিরে)
২৪	▪ জেলা প্রশাসক (স্বীয় দায়িত্বের আওতায়) ▪ পুলিশের এডিশনাল ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ▪ জেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ (নিজ নিজ দায়িত্বের আওতায়) ▪ সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং নৌ ও বিমান বাহিনীর সমপর্যায়ের অফিসারগণ

BCS Foreign

Foreign Service

The Foreign Service, a name that evokes visions of faraway places represents a country's interests abroad and works to maintain peaceful and cooperative relations with other nations. A career in the Foreign Service can offer excitement, challenge, and the satisfaction of serving one's country. The Foreign Service is first and foremost a diverse corps of professionals dedicated to representing their country's interests and responding to the needs of its citizens abroad.

Diplomacy

Diplomacy is the art and science of maintaining peaceful relationships between nations, groups, or individuals. People who practice diplomacy are called diplomats. Diplomats try to help their own country, encourage cooperation between nations, and maintain peace. Guided by the prudence of diplomats, diplomacy builds bridges between states, through wisdom, dialogue, and mutual respect.

History of Diplomacy

The art of diplomacy began in ancient times. Treaties between different cities in Mesopotamia in what is now Iraq date back to 2850 B.C.E. Leaders of Egypt and Canaan (an ancient country in the Middle East) exchanged diplomatic letters in the 14th century B.C. Writing on the walls of ancient Mayan buildings in what is now Mexico indicates that Mayan cities exchanged diplomats. Embassies were first established in northern Italy in the 14th century.

For most of history, diplomacy was concerned with bilateral relations, or negotiations between two nations. A country or region often had dozens of trade or border agreements, each limited to a single other country or region. Bilateral relations are still a very common form of diplomacy.

In the 20th century, diplomacy expanded. Today, the United Nations (UN), an international organization that works to promote cooperation and settle conflicts among nations, plays a large role in diplomacy. The General Assembly, the main body of the UN, has 195 members.

Diplomacy also grew to include summit meetings. Summits are meetings between top government officials. Summits can be between national leaders, such as presidents or prime ministers. Economic summits often involve business leaders as well as treasury secretaries or trade ministers.

Camp David, in the U.S. state of Maryland, is the site of many summits between American presidents and foreign leaders. In 1978, President Jimmy Carter held an important summit with Egyptian President Anwar Al-Sadat and Israeli Prime Minister Menachem Begin. Egypt and Israel had been in conflict for more than 30 years. Often, as during the Six Day War of 1967, the conflict was violent. The summit between Carter, Al-Sadat, and Begin resulted in the so-called "Camp David Accords." This established the basis for the Israel-Egypt Peace Treaty. Begin and Al-Sadat shared the Nobel Peace Prize in 1979, and the treaty is still enforced today. The Camp David Accords are considered a triumph of diplomacy.

Diplomacy also involves large international conferences. Like summits, international conferences are usually attended by heads of state or other national leaders. Conferences are usually much larger in scope–dozens of leaders may meet to discuss migration or border issues, trade, or the environment.

How Diplomacy Works

Diplomacy is accomplished by negotiation and bargaining. Usually, each group in a negotiation will ask for more than they expect to get. They then compromise, or give up some of what they want, in order to come to an agreement. Often, an outside diplomat will help with the negotiations. For example, Martti Ahtisaari, a Finnish diplomat working for the UN, helped Namibia gain independence from South Africa in 1990.

Sometimes, one side in a negotiation refuses to compromise. When this happens, others involved in the negotiation may use diplomatic sanctions. Diplomatic sanctions involve the reduction or removal of all embassy staff from the offending country. Lighter diplomatic sanctions may involve the refusal of a president to visit the offending country or meet with its leaders. Nicaragua cut off all diplomatic relations with Israel, for instance, in 2010. Nicaragua was protesting Israel's attack on a shipment of aid to the Gaza Strip.

Countries may also threaten to use economic sanctions or penalties. In 2006, many countries agreed not to trade with North Korea in an effort to stop the country from illegally testing nuclear weapons.

Other times, diplomats threaten to use force if a settlement is not reached. In 1990, Iraq invaded the neighboring country of Kuwait. When Iraq refused to leave Kuwait, the United Nations approved a military response. A coalition, or group of nations working together, fought the Iraqi army, forcing them out of Kuwait.

Ministry of Foreign Affairs

The Ministry of Foreign Affairs formulates and executes the foreign policy of the Government of Bangladesh. The core guidance for policy formulation comes from the relevant section of the Constitution of Bangladesh. In developing the external policy of the Republic, the Ministry draws from the laws of the land, acts of the Parliament, international treaties that Bangladesh is a state party to and other customary sources. In discharging its functions, the Ministry follows the provisions of the Rules of Business of the Government of Bangladesh. The Foreign Ministry represents the state to foreign governments and international organizations through its 80 missions across the globe. The Ministry's goals are to develop and maintain friendly relations with other states and foster cooperation with developed, developing, and least developed countries, and various regional, sub-regional, political, and economic groups. The Ministry pursues Bangladesh's external economic and trade interests, promotes its culture abroad, and disseminates information to foreign countries. It safeguards the legal rights and promotes the interests of its citizens and other legal entities in foreign countries. The Ministry discharges its diverse duties through its headquarters in Dhaka and through its network of missions abroad. The work of the ministry is conducted by a number of wings. These divisions gather, analyze and process information, set priorities, and draw up options according to the allocation of their individual areas and responsibilities.

Foreign Policy of Bangladesh

The Foreign Policy of Bangladesh emanates from the following provisions of the constitution of the People's Republic of Bangladesh. Article 25: promotion of international peace, security and solidarity.

The State shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries, peaceful settlement of international disputes, and respect for international law and the principles enunciated in the United Nations Charter, and on the basis of those principles shall–

(a) Strive for the renunciation of the use of force in international relations and for general and complete disarmament;
(b) Uphold the right of every people freely to determine and build up its own social, economic and political system by ways and means of its own free choice; and
(c) Support oppressed peoples throughout the world waging a just struggle against imperialism, colonialism, or racialism.

Evolution of Bangladesh's Foreign Policy: From Foundational Principles to Strategic Diplomacy

In the early years after independence in 1971, Bangladesh's foreign policy was shaped by a desire to establish sovereign identity, international recognition, and peaceful coexistence. The new nation emphasized principles such as non-alignment, support for global peace, decolonization, and respect for international law. Bangladesh joined the United Nations (UN) in 1974 and actively engaged in the Non-Aligned Movement (NAM) and the Organization of Islamic Cooperation (OIC) to strengthen its position globally and regionally.

During the 1980s and 1990s, the focus of foreign policy shifted from ideological solidarity to economic and regional cooperation. Bangladesh became a founding member of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) in 1985, aiming to enhance regional connectivity and collaboration. The country diversified its bilateral relations, fostering cooperation with India, China, the United States, and countries in the Middle East. Economic liberalization and participation in global financial institutions further integrated Bangladesh into the international system.

In the 2000s, Bangladesh adopted a more pragmatic and strategic approach. Economic diplomacy emerged as a key tool to promote trade, attract foreign direct investment, and expand labor markets abroad. Relations with India improved in areas such as trade facilitation, connectivity, and energy cooperation. At the same time, China became a significant partner in infrastructure development through large-scale projects, including those aligned with the Belt and Road Initiative. Bangladesh also strengthened partnerships with Japan, ASEAN nations, the European Union, and the United States. The country's global profile rose through its leadership in climate diplomacy and its role as one of the top contributors to United Nations peacekeeping operations. These efforts enhanced its soft power and global reputation. The influx of over one million Rohingya refugees from Myanmar since 2017 presented a major foreign policy challenge, requiring sustained diplomatic engagement with regional and global actors.

In recent years, Bangladesh has taken steps to align its foreign policy with emerging global and regional trends. The publication of the Indo-Pacific Outlook in 2023 indicated a focus on strategic balance, maritime security, economic integration, and adherence to international norms. Amid increasing geopolitical competition in the region, Bangladesh continues to pursue a balanced, multi-directional foreign policy aimed at safeguarding national interests and promoting sustainable development.

Hierarchy of BCS Foreign Affairs

Hierarchy of Headquarter

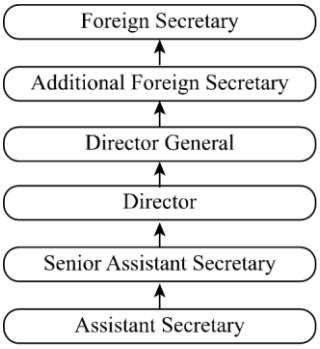

Hierarchy of Missions Abroad

A Bangladeshi diplomat can be appointed in five types (Embassy, High Commission, Deputy High Commission, Consulate General and Assistant High Commission) of mission in abroad. Their respective hierarchy is given below-

Embassy	High-Commission	Deputy High-Commission	Consulate General	Assistant High-Commission
Ambassador	High-Commissioner	——	——	——
Deputy Ambassador/ Minister	Deputy High-Commissioner/ Ministers (Not all missions have DHC)	Deputy High-Commissioner	Consul General	——
Counselor	Other Ministers (if any)	Counselor	Consul	Assistant High-Commission
First Secretary	Counselor	First Secretary	Vice Consul	First Secretary
Second Secretary	First Secretary	Second Secretary	Vice Consul	Second Secretary
Third Secretary	Second Secretary	Third Secretary	Vice Consul	Third Secretary
Attache	Third Secretary	Attache	Attache	Attache
	Attache			

[Note that when it comes to diplomatic missions among Commonwealth nations, they are referred to as High Commissions, Deputy High Commissions and Assistant High Commission rather than using terms Embassies, Consulates General, and Consul.]

Role of Ministry of Foreign Affairs in Liberation War

The story of Bangladesh's birth is that of pride and pain, of valor and sacrifice, of blood and tears. No nation has sacrificed so much for freedom, for dignity. Our war of liberation was the climax of an epic struggle of our people for freedom against the thousand years of oppression by colonial rulers. People from all walks of life and from every corner of the land responded to the clarion call of independence. Bengali diplomats working in the Pakistani missions abroad were no exception. And thus, the Foreign Ministry was born, even before the country could gain complete control over its own territory from the occupying forces.

On 06 April 1971, two young Bengali diplomats, K. M. Shehabuddin, Second Secretary of the Pakistan High Commission in New Delhi and Amzadul Haq, Assistant Press Attaché of the same mission defected and declared their allegiance to the cause

International Organizations and Agreements

Commonwealth:
An association of sovereign states which has grown out of the constitutional development and subsequent disintegration of the British Empire. Commonwealth countries used to accept the empire of the British monarchy to be their figurehead. Now, this is not a requirement anymore.
An embassy established by one commonwealth country to another is called High Commission. A High Commissioner effectively performs the duties of an ambassador.

United Nations:
United Nations Organization is an international organization founded on October 24, 1945 after the Second World War to promote international peace and cooperation. It is the replacement of the League of Nations. It was created to prevent another World War.

Genocide Convention:
Adopted by the UN General Assembly in 1948, this establishes rules for the punishment of persons committing the international crime of genocide. The Convention entered into force in 1951.

Universal Declaration of Human Rights:
A declaration of the UN General Assembly passed in 1948 set out the basic rights and fundamental freedoms to which all men and women everywhere in the world were deemed to be entitled. The subsequent endeavour to translate these rights into legal (and hence binding) obligations bore fruit in two 1966 treaties: the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which entered into force in 1976, and to both of which the majority of states are parties.

Diplomacy

360° Diplomacy

It denotes a comprehensive and all encompassing diplomatic approach where a country maintains balanced relations with all major global and regional actor, regardless of their rivalries or ideological differences.
Key features:
- Non aligned and balanced foreign policy.
- Engaging with multiple powers simultaneously.
- Focusing on national interest over ideological alignment.
- Flexibility in foreign relation.
- Emphasis on economic security and development cooperation.

Economic Diplomacy

Economic diplomacy means using trade, investment, aid and economic cooperation as tools to build good relationships and promote a country's interests abroad. It involves using diplomatic channels to negotiate trade agreements, promote investments, resolve economic disputes, and influence global economic policies. Economic diplomats work to attract foreign investment, support domestic businesses abroad, and enhance market access for their country's goods and services. They also engage in economic intelligence gathering, analysis, and advocacy to secure beneficial economic outcomes and strengthen economic ties with other nations. Overall, economic diplomacy plays a crucial role in promoting economic growth, fostering international trade relations, and advancing national interests in the global economy.

Balanced diplomacy

Balanced diplomacy is a strategy where a country avoids taking sides between major powers. Instead of tethering itself to one superpower, the nation maintains steady, functional relationships with all of them to protect its own independence and get the best possible economic and security deals from everyone.

Multilateral diplomacy

Multilateral diplomacy is a diplomatic approach in which multiple countries work together to address common issues and challenges. Instead of just two countries making a deal (bilateral), it's like a massive team meeting-think the United Nations-where everyone tries to agree on shared rules for things that affect the whole world, like climate change, trade, or keeping the peace.

Ad-hoc Diplomacy

Ad-hoc diplomacy involves spontaneous diplomatic actions taken to address immediate international issues or opportunities. It responds swiftly to crises, facilitates negotiations, or seizes emerging chances in global relations. While less structured than formal diplomacy, it offers flexibility and agility in navigating complex and rapidly changing diplomatic landscapes.

Chequebook Diplomacy

Chequebook diplomacy refers to a foreign policy strategy in which a country uses financial aid, loans, donations or economic incentives to gain diplomatic support, political recognition or strategic influence from other countries. This diplomacy can sometimes be viewed as a form of soft power, where economic resources are used to cultivate relationships, improve diplomatic ties, or advance specific national interests through financial means rather than traditional diplomatic negotiations or coercive measures.

Sports Diplomacy

Sports diplomacy uses sports as a tool to promote international understanding, build relationships between nations, and bridge cultural divides through shared athletic activities and exchanges. It leverages the universal appeal of sports to foster dialogue, cooperation, and goodwill on a global scale.

Commercial Diplomacy

Commercial diplomacy leverages diplomatic channels to advance economic interests, promote trade, and protect investments internationally. Diplomatic missions engage in negotiating trade agreements, reducing tariffs, and eliminating barriers to facilitate the flow of goods and services. They advocate for fair treatment of their nationals and businesses abroad, resolve disputes, and provide economic intelligence to support market access. Through activities such as trade missions and business forums, commercial diplomacy aims to attract foreign investment and foster economic cooperation between countries, contributing to global economic integration and enhancing opportunities for sustainable economic growth.

Coercive Diplomacy

Coercive diplomacy refers to the use of threats, sanctions, or limited military actions to persuade an opponent to change its behavior. It combines elements of both diplomacy (negotiation and dialogue) and coercion (the threat or use of force or punitive measures). The aim of coercive diplomacy is typically to achieve specific political, economic, or military goals without resorting to full-scale military conflict. It relies on the credible threat of punishment or negative consequences to influence the decision-making of the opponent.

Cultural Diplomacy

Cultural diplomacy utilizes cultural exchanges, arts, education, and other cultural activities to foster understanding, goodwill, and cooperation between nations. It aims to build relationships, promote a country's cultural heritage, and enhance mutual respect and trust. Cultural diplomacy often involves showcasing arts, music, literature, cuisine, and traditions to bridge cultural divides, promote dialogue, and address global issues collaboratively. It operates alongside traditional diplomacy to strengthen ties, improve international relations, and create opportunities for people-to-people connections that transcend political and economic differences, contributing to a more interconnected and culturally enriched global community.

Gift-basket Diplomacy

Gift-basket diplomacy refers to the practice of using carefully curated gifts, often symbolic or culturally significant items, to convey messages, build relationships, or express goodwill between countries or diplomatic counterparts. These gift baskets typically contain items that represent the giver's culture, traditions, or regional specialties, aimed at creating a positive impression and fostering diplomatic ties through thoughtful gestures. Gift-basket diplomacy is a subtle form of soft power, emphasizing cultural diplomacy and the importance of personal gestures in international relations.

Questionnaire

Question-01 : Why BCS Foreign Affairs is your first choice?

Answer:

I am deeply enthusiastic about pursuing a career in the foreign service as a BCS foreign cadre. My aspiration is to become a diplomat. I believe I possess distinctive qualities, such as strong communication skills, analytical acumen, and a rapid learning ability, which aligns well with the prerequisites of a foreign cadre role. Additionally, there are several other appealing aspects to this career path:

1. Advancement within this cadre is notably seamless.
2. Attractive allowances are provided for those serving in embassy postings.
3. Diplomatic passports are accessible, offering diplomatic immunity and special privileges.
4. The opportunity to explore the world through travel is an enticing prospect.

Question-02 : What is the difference between foreign policy and diplomacy?

Answer:

Foreign Policy	Diplomacy
Foreign policy is a set of goals about how a country will represent itself in the international area harnessing its national interests.	Diplomacy is the art or tool to achieve those goals.
Foreign policy is theory;	Diplomacy is the application of the theory.
Foreign policy is political.	Diplomacy is official.

Question-03 : What are the similarities between High Commissioner and Ambassador?

Answer:

i. High commissioner and Ambassador both are the heads of the diplomatic missions abroad.
ii. Their responsibilities are the same.
iii. Their facilities are the same.

Question-04 : What is the difference between High Commissioner and Ambassador?

Answer :

High Commissioner	Ambassador
When the highest diplomatic representative of one commonwealth country goes to another commonwealth country is known as High Commissioner.	When the highest diplomatic representative of one commonwealth country/Member of the UN goes to another non-commonwealth country is known as Ambassador.
Example: When the highest diplomatic representative of Bangladesh goes to the UK, he/she will be called High Commissioner.	Example: (i) When the highest diplomatic representative of the USA goes to Russia, he/she will be called an Ambassador. (ii) The same movement from Bangladesh to the USA.

Question-05 : What are the qualities of an ideal diplomat?

Answer:

i. Ability to negotiate national cases in the regional and global spheres.
ii. He/she must have the ability to protect the national interest of the sending state.
iii. He/she must have a good command over the language.
iv. He or she has to be well informed of international issues.
v. He or she must be a catalyst for peace and understanding.
vi. Good drafting skill, multilingual competence (French, Spanish).
vii. Special knowledge on the subject, training, skill and art of recognition is required.
viii. Ability to read over and absorb quickly massive volumes of documents come into sharper focus in negotiation.
ix. Patience, tenacity, coolness, taking pressure, ability to win people's minds and appreciation of another's point of view.

Question-06 : What are the functions of a diplomat?

Answer: The functions of a diplomat are:

i. Representing the sending state in the host state.
ii. Protecting the national interests the sending state.
iii. Negotiating with the government of receiving state.
iv. Promoting friendly relation between the sending and the receiving states.
v. Reporting to the sending state about the policy of the receiving state.

Question-07 : What are the diplomatic privileges and immunities?

Answer:

i. A diplomat cannot be arrested.
ii. A diplomat does need not to pay any tax / A diplomat is exempt from paying taxes.
iii. The receiving state shall take all appropriate steps to prevent any attack on him, his family members and his freedom or dignity.
iv. The private residence of a diplomat will be protected.

Question-08 : Why is economic diplomacy given more importance in the present time?

Answer : After the collapse of the USSR, the world is a univocal world. Countries that previously relied in warfare came to realize that economic development is the first thing to achieve its dominance and authority in the international arena. Moreover, to become a welfare state, financial development is a must. For these reasons, every nation is putting greater stress on economic diplomacy in the present age.

Question-09 : What are the limitations of Bangladesh in making foreign policy?

Answer:

i. Political instability
ii. Corruption
iii. Shortage of energy
iv. Red tapism
v. Natural disasters
vi. Poverty
vii. Unskilled human capital
viii. Limited Diplomatic resources
ix. Dependence of foreign aid and remittances
x. Geopolitical pressure from major powers
xi. Weak economic diplomacy
xii. Limited technological and research capacity.

Question-10 : What is Ping-Pong diplomacy?

Answer : Ping-Pong diplomacy refers to the diplomatic initiative between the USA and China to break the icy relationship between the two countries through arranging a friendly table tennis match between the players of the two countries and exchange of players in the early 1970s. Table-tennis is known as Ping-Pong in China. The event paved the way for a visit to Beijing by President Richard Nixon.

Question-11: What is multilateral diplomacy?

Answer : Multilateral diplomacy is a form of international relations involving multiple countries working together on issues of common interest. It typically takes place in international organizations, such as the United Nations, where representatives from various nations negotiate, collaborate, and make decisions on global challenges. This approach contrasts with bilateral diplomacy, which involves direct relations between two countries. Multilateral diplomacy aims to address issues that transcend national borders, such as climate change, global health, and peacekeeping, by fostering cooperation and consensus among many states.

Question-12: What is economic diplomacy?

Answer : Economic diplomacy refers to the use of a country's economic resources, policies, and relationships to achieve its international objectives and enhance its economic interests. This can involve various activities, such as trade negotiations, investment promotion, economic sanctions, development aid, and participation in international economic organizations. The goal of economic diplomacy is to strengthen a nation's economic ties, promote its businesses abroad, secure favorable trade agreements, and use economic tools to influence international relations and achieve strategic goals.

Question-13: Tell about United Nations Organization?

Answer : United Nations Organization is an international organization founded on October 24, 1945 after the Second World War to promote international peace and cooperation. It is the replacement of the League of Nations. It was created to prevent another World War. From its 51 founding countries, the UN has grown to 193 countries and 2 observer states.

বিসিএস পুলিশ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে ২৬টি ক্যাডারের মধ্যে বিসিএস পুলিশ ক্যাডার অন্যতম একটি। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় যোগদান করতে হলে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে উত্তীর্ণ হতে হয়। এ পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তারা সহকারী পুলিশ সুপার (এ.এস.পি) / সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদায় যোগদান করেন।

পুলিশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পুলিশ (Police) একটি ইংরেজি শব্দ যার উৎপত্তি পর্তুগিজ শব্দ 'পোলিশ' থেকে। প্রাচীনকালে গ্রিসে যারা শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকতো তাদেরকে 'Politeia' বলা হতো। পুলিশ (Police) শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়-

P = Polite (নম্র)	O = Obedient (অনুগত)	L = Loyal (বিশ্বস্ত)
I = Intelligent (বুদ্ধিমান)	C = Courageous (সাহসী)	E = Efficient (দক্ষ)

পুলিশের একটি দীর্ঘ এবং অনেক পুরাতন ইতিহাস রয়েছে। সেই প্রাচীন কালেই সম্রাট অগাস্টেসের সময়ে প্রাচীন রোমে বিশেষ বাহিনী হিসেবে পুলিশের প্রচলন ঘটে। চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ ব্যবস্থার সুপারিশ করেন। সুলতানি আমলে পুলিশের একটি সরকারি স্তর বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। তবে মধ্যযুগে বিশেষ করে ভারতবর্ষে সুসংগঠিত পুলিশি ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন শের শাহ সুরি। এমন পরিস্থিতিতে ব্রিটেনের তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রবার্ট পিল (আধুনিক পুলিশের জনক) ১৮২৯ সালে আধুনিক পুলিশ ব্যবস্থার ধারণা দেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পুলিশ গঠনের বিল আনেন এবং গঠন করেন লন্ডন মেট্রো পুলিশ। ১৮৪৫ সালে লন্ডন মেট্রো পুলিশের অনুকরণে গঠিত হয় নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ।

রবার্ট পিল : রবার্ট পিল ১৭৮৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৪ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কনজারভেটিভ দলের নেতা হিসেবে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এর পূর্বে অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র সচিব থাকাকালীন সময়ে তিনি আধুনিক পুলিশ বাহিনী প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮২৯ সালে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠা করেন। পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয় নৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তিনি বেশকিছু ধারণা প্রবর্তন করেন যা 'Peelian Principles' নামে পরিচিত। তাকে আধুনিক পুলিশের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং তাকে Community Policing ধারণার প্রবর্তক বলা হয়।

উপমহাদেশে পুলিশের ইতিহাস

পিলস অ্যাক্ট-১৮২৯ এর অধীনে লন্ডন পুলিশের সাফল্যে ব্রিটিশ সরকার অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে স্বতন্ত্র পুলিশ ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৬১ সালে "The Rules of the Police Act" (Act V of 1861) ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয়। এই আইনের অধীনে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে একটি করে পুলিশ বাহিনী গঠিত হয়। ব্রিটিশদের তৈরীকৃত এই ব্যবস্থা এখনো বাংলাদেশ পুলিশে প্রবর্তিত আছে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর বাংলাদেশ অঞ্চলের পুলিশের নাম ইস্ট বেঙ্গল পুলিশ রাখা হয়। পরবর্তীতে এটি পরিবর্তিত হয়ে ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ নাম ধারণ করে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাস হতেই ইস্ট বেঙ্গল পুলিশের উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারায় পাকিস্তান সরকার।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখে চূড়ান্ত বিজয়ের সাথে সাথে ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ পরিবর্তিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ নাম ধারণ করে। বাংলাদেশ পুলিশ একটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী এবং এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশ

বাংলাদেশ পুলিশের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সময় হলো ১৯৭১ সাল। পুলিশ বাহিনী ২৫ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে ঢাকার রাজারবাগের পুলিশ লাইনে ৩০৩ রাইফেল (২য় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়) দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর মাধ্যমে দেশের পুলিশ বাহিনীর উপর পাকিস্তান সরকার কর্তৃত্ব হারায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র প্রতিরোধই বাঙালি জনগণের নিকট যুদ্ধ শুরুর বার্তা পৌঁছে দেয়। পরবর্তীতে পুলিশের এই সদস্যরা ৯ মাস দেশব্যাপী গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর অবদানকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা:

১ম পর্যায় : ২৪ মার্চ, ১৯৭১ এর পূর্ব পর্যন্ত,

২য় পর্যায় : ২৫ মার্চ, ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত।

বিসিএস পুলিশ ক্যাডার

বিসিএস পুলিশ এ যোগদানের যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ

বিসিএস (পুলিশ)-এ যোগদানের ধাপসমূহ: বিসিএস (পুলিশ)-এ যোগদানের জন্য বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয়।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা: কমপক্ষে স্নাতক পাশ হতে হবে।

২. শারীরিক যোগ্যতা: (ক) উচ্চতা কমপক্ষে পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫৬ সে.মি. বা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং দৈহিক ওজন সর্বনিম্ন ৫৪.৫৪ কেজি।
(গ) মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫২.৪০ সে.মি. বা ৫ ফুট এবং দৈহিক ওজন সর্বনিম্ন ৪৫.৪৫ কেজি।

প্রশিক্ষণ: ১ বছরের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে ৪ মাসের এটাচমেন্ট ও সাভারে ৪ মাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ শেষে পোস্টিং হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য

বাংলাদেশ পুলিশের ক্ষমতা: পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা রয়েছে। পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১, পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল-১৯৪৩, বিভিন্ন পুলিশ অধ্যাদেশ ও ফৌজদারি আইনানুযায়ী পুলিশ গ্রেফতার, তল্লাশি ও আলামত জব্দ, উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা, বিভিন্ন অপরাধের তদন্ত, সাক্ষীদের প্রশ্ন এবং সন্দেহভাজন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ ও আটক করতে পারে।

পুলিশের দায়িত্ব: পুলিশ আইনানুসারে পুলিশের দায়িত্বসমূহ হলো -

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধান করা;
২. জনসাধারণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা;
৩. অপরাধ, শোষণ, বঞ্চনা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
৪. জনগণের মধ্যে বিশেষ করে দরিদ্র, অক্ষম, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৫. মহিলা ও শিশুদের প্রতি হয়রানি বা উৎপীড়ন প্রতিরোধ করা; এবং
৬. পুলিশি ব্যবস্থায় জনগণকে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

পুলিশের কর্তব্য: আইনি বিধান সাপেক্ষে প্রত্যেক পুলিশ অফিসারের কর্তব্য হবে-

১. জনগণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ সাধন;
২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
৩. ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতিসহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখা;
৪. নাগরিকদের জীবন, সম্পদ ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা;
৫. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির অধিকার ও সুবিধাবাদি রক্ষা করা;
৬. অপরাধ এবং গণ-উপদ্রব সংঘটন প্রতিরোধ করা;
৭. সামাজিক শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও জাতীয় স্বার্থ সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ ও বিতরণ করা;
৮. সড়ক, জনপথ, রাস্তাঘাট, মেলা, উন্মুক্ত স্থান ও পথ, জনগণের প্রবেশাধিকার সম্বলিত স্বাস্থ্য ও বিনোদন কেন্দ্র, মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য গণ উপাসনালয় ইত্যাদিতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যেকোনো প্রকার উপদ্রব ও প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করা;
৯. সড়ক, জনপথ, রেলপথ, পানিপথ ও রাস্তাঘাটে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং জনসাধারণ ও যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা আনয়ন করা; এবং
১০. আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সকল আইনসংগত আদেশ মান্য করা ও সত্বর কার্যকরে সাহায্য করা ।

বাংলাদেশ পুলিশ: পদবি পরিচিতি

বাংলাদেশ পুলিশের পদমর্যাদার ব্যাজসমূহ

পদমর্যাদা	পদের ব্যাজ
মহা-পুলিশ পরিদর্শক (IGP)	১ তলোয়ার ১ ক্রস ছড়ির ১ শাপলা ও ১ পিপ
অতিরিক্ত মহা পুলিশ পরিদর্শক (Add. IGP)	১ তলোয়ার ১ ক্রস ছড়ির ও ১ শাপলা
উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক (DIG)	১ শাপলা ও ৩ পিপস
অতিরিক্ত উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক (Add. DIG)	১ শাপলা ও ২ পিপস
পুলিশ সুপার (SP)	১ শাপলা ও ১ পিপ

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (Add. SP)	১ শাপলা
সহকারী পুলিশ সুপার (ASP)	২ পিপস/৩ পিপস
পরিদর্শক (Inspector)	১ পিপ
উপ-পরিদর্শক (SI)/ সার্জেন্ট	২ ফুল
উপ- সহকারী পরিদর্শক (ASI)	১ ফুল
নায়েক	২ ফিতা (লাল)
কনস্টেবল	কোন ব্যাজ নেই

পুলিশের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানের পদবি

বিভাগ	পদবি
স্পেশাল ব্রাঞ্চ	এডিশনাল আইজি
ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ	এডিশনাল আইজি
সিআইডি	এডিশনাল আইজি
আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন	ডিআইজি
রেলওয়ে পুলিশ	ডিআইজি
শিল্পাঞ্চল পুলিশ	ডিআইজি
নৌ পুলিশ	ডিআইজি
হাইওয়ে পুলিশ	ডিআইজি
পর্যটন পুলিশ	ডিআইজি
পুলিশ উইমেন নেটওয়ার্ক	ডিআইজি
মেট্রোপলিটন পুলিশ	ডিআইজি
ইমিগ্রেশন পুলিশ	ডিআইজি
পুলিশ ইন্টারনাল ওভার সাইট	এআইজি
সোয়াট	ডিআইজি

বাংলাদেশ পুলিশ: পদসোপান

বাংলাদেশ পুলিশের পদসোপান

মহা-পুলিশ পরিদর্শক (Inspector General of Police/IGP)
↑
অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক (Additional Inspector General of Police/Add.IGP)
↑
উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক (Deputy Inspector General of Police/DIG)
↑
অতিরিক্ত উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক (Additional Deputy Inspector General of Police/Add.DIG)
↑
পুলিশ সুপার (Superintendent of Police/SP)
↑
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (Additional Superintendent of Police/Add.SP)
↑
সহকারী পুলিশ সুপার (Assistant Superintendent of Police/ASP)

কমিউনিটি পুলিশ

'পুলিশই জনতা ও জনতাই পুলিশ' এ মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক দেশ এবং জনগণ এই দেশের মালিক সুতরাং জনগণকে সাথে নিয়ে অপরাধ নির্মূলে ভূমিকা রাখা জরুরি। কমিউনিটিং পুলিশিং হচ্ছে অপরাধ সমস্যা সমাধানে পুলিশ ও জনগণের যৌথ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার একটি নতুন পুলিশিং দর্শন। আমাদের দেশে পুলিশিং কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কার্যকরভাবে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য কমিউনিটি পুলিশিং ধারণা বহন করা হয়েছে। কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থায় কমিউনিটির সদস্যগণ, সমাজের বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পুলিশের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অপরাধ প্রতিরোধ ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কমিউনিটি পুলিশিং মূলত একটি প্রতিরোধমূলক পুলিশিং ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় অপরাধের কারণগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অপরাধের কারণগুলো দূর করা যেহেতু পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয় তাই এই কাজে অন্যান্য ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পুলিশ জনগণকে নিজ নিজ এলাকার অপরাধগুলো প্রতিরোধ করতে পারে। তার জন্য আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়, অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করা, অপরাধ কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য বা পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২ বা ৪৩ ধারার ভিত্তিতে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কমিউনিটি পুলিশ হচ্ছে অপরাধ ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে পুলিশ ও জনগণের যৌথ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার একটি নতুন পুলিশি দর্শন।

- পুলিশের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট পিলের গণমুখী পুলিশিং এর মূলনীতি হতেই মূলত কমিউনিটি পুলিশের সৃষ্টি;
- কমিউনিটি পুলিশ হলো পুলিশকে সহায়তা করার জন্য জনগণের একটি সংগঠিত শক্তি;
- পুলিশ রেগুলেশনের ৩২ প্রবিধিতে এর উল্লেখ আছে;

বৈশিষ্ট্য: কমিউনিটি পুলিশ এর বৈশিষ্ট্যগুলো হলো –

১. কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা পুলিশ ও জনগণের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ নিশ্চিত করে;
২. এটি একটি প্রতিরোধমূলক ও সমস্যা সমাধান ভিত্তিক পুলিশ ব্যবস্থা;
৩. এ ব্যবস্থায় জনগণ এলাকার সমস্যা ও সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে পুলিশের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ পায়;
৪. জনগণের নিকট পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয় এবং পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সমঝোতা ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়;
৫. পুলিশ ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমে এবং জনগণের মধ্যে পুলিশি ভীতি ও অপরাধ হ্রাস পায় এবং জনগণ পুলিশকে সহায়তা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।

পুলিশ কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক আইনসমূহ

আইনসমূহ	সাল	আইনসমূহ	সাল
বাংলাদেশ দণ্ডবিধি	১৮৬০	চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন	১৯৭৮
পুলিশ অ্যাক্ট	১৮৬১	আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অর্ডিন্যান্স	১৯৭৯
সাক্ষ্য আইন	১৮৭২	রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন	১৯৮৪
ফৌজদারি কার্যবিধি	১৮৯৮	খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন	১৯৯২
পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল	১৯৪৩	বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন	২০০৬
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন	১৯৭৬	সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন	২০০৬

দণ্ডবিধি, ১৮৬০

প্রারম্ভিক আলোচনা: দণ্ডবিধি (Penal Code) অপরাধ সংক্রান্ত একটি মৌলিক বা তত্ত্বগত আইন। এই আইনে বিভিন্ন অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, অপরাধ সংঘটনের বিভিন্ন উপাদান এবং শাস্তির পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু সেগুলোর বিচারের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়নি। দণ্ডবিধির অধীন অপরাধসমূহ কীভাবে বিচার করা হবে তা দণ্ড সম্পর্কিত পদ্ধতিগত আইন, ফৌজদারি কার্যবিধিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাস

লর্ড ম্যাকলের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ভারতের প্রথম আইন কমিশন গঠিত হয় ১৮৩৪ সালে। ১৮৩৭ সালে কমিশন দণ্ডবিধি আইনের খসড়া জমা দেন। ১৮৬০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইনটি পাশ হয় এবং ১৯৬২ সাল হতে কার্যকর হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান এই আইনটি সরাসরি গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তীতে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন হওয়ার পূর্বে প্রচলিত অধিকাংশ আইনই সরাসরি গ্রহণ করে নেয়, এবং তার মধ্যে দণ্ডবিধি, ১৮৬০ অন্যতম। সর্বশেষ ২০০৪ সালে সংসদে এই আইনটির গৌণ পরিবর্তন (মাশুল বাড়ানো ও অন্যান্য) আনা হয়।

দণ্ডবিধি, ১৮৬০ আইনটিতে মোট ৫১১ টি ধারা এবং ২৩ টি অধ্যায় রয়েছে।

দণ্ড: দণ্ডবিধির ধারা ৫৩ তে ৫ প্রকার দণ্ডের বা শাস্তির কথা বলা হয়েছে। যথা-

১. মৃত্যুদণ্ড, ২. যাবজ্জীবন কারাবাস, ৩. কারাবাস [(ক) সশ্রম ও (খ) বিনাশ্রম], ৪. সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও ৫. অর্থদণ্ড

❑ যাবজ্জীবন কারাবাস

যাবজ্জীবন কারাবাস অর্থ অবশিষ্ট জীবনব্যাপী সশ্রম কারাবাস। সম্প্রতি Ataur Mridha and Anwar Hossain v. State মামলায় আপিল বিভাগ যাবজ্জীবন কারাবাসকে নিম্নলিখিতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন –

Life imprisonment means a sentence of rigorous imprisonment for the whole of the remaining period of the convicted person's natural life. [যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো একজন দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের অবশিষ্ট জীবনব্যাপী সশ্রম কারাবাস]

সুতরাং দণ্ডবিধির ৫৩ ধারার অধীন যাবজ্জীবন কারাবাস বলতে দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবনের অবশিষ্ট জীবনব্যাপী সশ্রম কারাবাস বলে গণ্য করতে হবে।

যাবজ্জীবন কারাবাস বলতে ২০ (বিশ) বৎসর বা ৩০(ত্রিশ) বৎসর কারাবাসকে বোঝায় না অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস বলতে এমনও বোঝায় না যে ৩০ বৎসর বা ২০ বৎসর কারাভোগ করার পর দণ্ডিত ব্যক্তি আপনা-আপনি মুক্তি পাবে বরং সে মুক্তি পেতে পারে যদি সরকার তার শাস্তি কমায়। যদি সরকার কোনো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোনো আসামির শাস্তি দণ্ডবিধির ৫৫ ধারায় হ্রাস (Commute) করে বা ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার শর্তাধীন শাস্তি মওকুফ করে শুধু তখনই কোনো যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি ২০ বৎসর সাজা ভোগ করার পর মুক্তি পেতে পারে। যদি যাবজ্জীবন কারাবাসের মেয়াদ কোনো যথাযথ কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকার দণ্ডবিধি বা ফৌজদারি কার্যবিধির অধীন না কমায়, তাহলে দণ্ডিত ব্যক্তি তার জীবনব্যাপী কারাবাস ভোগ করতে বাধ্য।

❑ শিশু কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কার্য

- ৯ বৎসরের কম বয়স্ক শিশু কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না। [ধারা – ৮২]
- ৯ বৎসরের অধিক কিন্তু ১২ বৎসরের কম বয়স্ক অপরিণত বোধশক্তিসম্পন্ন শিশুর কাজ কোনো অপরাধ নয়। [ধারা – ৮৩]

❑ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা

শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কখন মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে তা ১০০ ধারায় বলা হয়েছে এবং সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার কখন মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে তা ১০৩ ধারায় বলা হয়েছে।

- যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য:

ধারা ১০০ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ৬ (ছয়টি) ক্ষেত্রে শরীরের ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকারের সীমা মৃত্যু ঘটানো পর্যন্ত বিস্তৃত। যথা:

১. এমন আক্রমণ যা মৃত্যু ঘটানোর যুক্তিসংগত আশঙ্কা সৃষ্টি করে;
২. এমন আক্রমণ যা গুরুতর জখমের যুক্তিসংগত আশঙ্কা সৃষ্টি করে;
৩. ধর্ষণের অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ;
৪. অপ্রকৃত কাম লালসার অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ;
৫. মনুষ্যহরণ বা অপহরণের অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ;
৬. অবৈধভাবে আটকের অভিপ্রায় নিয়ে আক্রমণ।

১০৩ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার অধিকার প্রয়োগকালে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যাবে। যথা:

১. দস্যুতা;
২. রাত্রি বেলায় অপথে গৃহে প্রবেশ;
৩. বাসগৃহে বা সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত স্থানে অগ্নিসংযোগ করে ক্ষতিসাধন;
৪. চুরি, ক্ষতি বা অনধিকার গৃহপ্রবেশের ভীতি।

রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধসমূহ

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১২১	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা বা যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা করা	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১২১ক	বাংলাদেশের ভিতরে বা বাইরে অবস্থান করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ বা যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা করা অপরাধসমূহের ষড়যন্ত্র করা	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১২২	বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহকরণ	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১২৪ক	রাষ্ট্রদ্রোহিতা (Sedition)	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
১২৫	বাংলাদেশের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ কোনো এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, যুদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ বা যুদ্ধ ঘোষণায় সহায়তা করা	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

বেআইনি সমাবেশ

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১৪৩	বেআইনি সমাবেশের সদস্য হওয়া	৬ (ছয়) মাসের কারাদণ্ড
১৪৪	মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেআইনি সমাবেশে যোগদান করা	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড
১৪৫	কোনো বেআইনি সমাবেশ ভঙ্গ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে জেনেও উক্ত সমাবেশে যোগদান বা অবস্থান করা	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড
১৫৩খ	রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র প্রভৃতিকে প্ররোচিত করা	সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড

দাঙ্গা

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১৪৭	দাঙ্গা	২ (দুই) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
১৪৮	মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে দাঙ্গা	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
১৬০	মারামারি (Affray)	১ (এক) মাস কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা

সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
১৬১	সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
১৬২	কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে দিয়ে কোনো কাজ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুষ গ্রহণ	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

নিন্দনীয় নরহত্যা এবং খুনের শাস্তি

ধারা	অপরাধ	নির্ধারিত শাস্তি
৩০২	খুনের শাস্তি	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড
৩০৩	যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুনের শাস্তি	মৃত্যুদণ্ড
৩০৪	খুন বলে গণ্য নয় এমন নিন্দনীয় নরহত্যা শাস্তি	মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় নিয়ে নরহত্যা করলে সেই ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
		মৃত্যু ঘটানোর অভিপ্রায় ব্যতীত কিন্তু জ্ঞাত আছে যে এমন কার্য সম্ভবত মৃত্যু ঘটাবে বা এমন শারীরিক জখম ঘটাবে যা সম্ভবত মৃত্যু ঘটাবে তাহলে ১০ (দশ) বছরের কারাদণ্ড।

আঘাত ও গুরুতর আঘাত

ধারা	অপরাধ	শাস্তি
৩২৩	স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান	১ (এক) বছরের কারাদণ্ড বা ১০০০ টাকা জরিমানা
৩২৪	স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে আঘাত প্রদান	৩ (তিন) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৩২৫	স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান	৭ (সাত) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৩২৬	স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র বা অন্য মাধ্যমের সাহায্যে গুরুতর আঘাত প্রদান	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
৩২৬ক	স্বেচ্ছাকৃতভাবে দুই চোখ উপড়িয়ে ফেলা বা এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা দুই চোখের দৃষ্টি নষ্ট করা বা এসিড জাতীয় পদার্থ দ্বারা মুখ, মাথা বা উভয় চোখে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর জখম করা	মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড
৩৩০	বলপূর্বক অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান	৭ (সাত) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড
৩৩১	বলপূর্বক অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত প্রদান	১০ (দশ) বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড